বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীবাদের সংহতিকরণ

মুলঃ বার্টিল লিন্টনার
ভাষান্তরঃ সগিরালি খাঁন

(এক ঘোর দুঃসময় অতিক্রম করছে আজ বাংলাদেশ। মৌলবাদী শকুনদের থাবায় প্রিয় মাতৃভূমি রক্তাক্ত আজ। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র কিছু ফুট-সোলজারদের ধরছে, কিন্তু আসল গডফাদাররা রয়ে যাচ্ছে পর্দার অন্তরালে। বাংলা ভাই আর শায়খ রহমানদের কথা বলা হচ্ছে বারবার, অথচ তাদের যারা গডফাদার, সেই শায়খুল হাদিস, আমিনি, মাওলানা মুহিউদ্দিন, দেলওয়ার হোসেন সাইদিদের নাম ঘুনাক্ষরেও উচ্চারিত হয় না। অথচ আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগেই অনুসন্ধানী সাংবাদিক বার্টিল লিন্টনার এদের স্বরূপ উন্মোচন করে এই যুগান্তকারী প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। তথ্যনির্ভর ও যুগোপযোগী বিধায় সাধারণ পাঠকদের জন্যে প্রবন্ধটির ভাষান্তর করা হলো। বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীবাদের আসল হোতা কারা, প্রবন্ধটি পাঠ করলে আশা করি পাঠকদের কাছে তা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। অনুবাদক।)

আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই হোক কিংবা আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী উল্লেখ্যযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশী জেহাদির দেশে প্রত্যাবর্তনের ফলেই হোক- বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা ক্রমশই শিকড় গাড়ছে- এই মর্মে গোটাকয়েক নিবন্ধ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ছাপা হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের টনক নড়ে (১)। প্রথমিকভাবে রিপোর্টগুলিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে সরকার। (২) ঢাকা সরকারের এরূপ প্রতিক্রিয়া মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ দেশটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী ঋনের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের অনুদান কিংবা ঋন। এমতবস্থায় বহির্বিশ্বে ধর্মান্ধ জঙ্গীদের অভয়ারণ্য বলে পরিচিতি পাওয়া কোন সরকারেরই কাম্য হতে পারে না। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিগত এক দশক ধরে দেশটি এক তাৎপর্য্যপুর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এই রূপান্তর রাজনৈতিক এবং সামাজিক উভয়তঃ। যে সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশটির জন্ম হয়েছিল, তার পরিবর্তে ক্রমেই ইসলামি গন্ধমিশ্রিত এক নুতন ব্রান্ডের জাতীয়তাবাদ চালু হতে থাকে। উপরন্তু ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক এবং এনজিও সুত্রগুলো দেশটিতে জঙ্গীদের বেশ কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্পের সন্ধান দেয়, বিশেষ করে দেশটির দক্ষিনপশ্চিমাঞ্চলের মিয়ানমার সীমান্তে- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমনিতেই যথেষ্ট নাজুক যেখানে।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে দেশটি একটি কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। এই সরকারে গুরুত্বপুর্ণ মন্ত্রী হিসেবে ঠাই হয়েছে ইসলামী মৌলবাদী দল হিসেবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামীর দু'জন গুরুত্বপুর্ণ নেতার। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের এই প্রথম ক্ষমতারোহন। জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, ৩০০ আসনবিশিষ্ট পার্লামেন্টে এই দলের সদস্যসংখ্যা ১৭ জন। যে ৪ দলীয় জোট বিগত নির্বাচনে জয়ী হয়, তার নেতৃত্বে আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। বিএনপি ও জামায়াত ছাড়া এই কোয়ালিশনে আছে ইসলামী ঐক্য জোট নামক আরও একটি ক্ষুদ্র ইসলামী দল, যার চেয়ারম্যান হচ্ছেন শায়খুল হাদিস আজিজুল হক নামক এক ব্যক্তি। আজিজুল হক একই সঙ্গে হরকতুল জেহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ (সংক্ষেপে হুজি বা HUJI) নামক সর্বপ্রধান সন্ত্রাসী সংগঠনটির উপদেষ্টা কমিটির সদস্যও বটে। ইসলামী ঐক্যজোট নির্বাচনে ২টি আসন পায়, তবে দলটিকে কোন মন্ত্রীত্বের পদ দেয়া হয়নি। মোর্চার চতুর্থ সদস্য জাতীয় পার্টির একটি ফ্যাকশন, নেতৃত্বে আছেন নাজিউর রহমান মঞ্জু। এই গ্রুপটির পেছনে কোন ইসলামী প্রোফাইল নাই। (৩)

'আওয়ামী লীগ একটি করাপ্ট পার্টি'- জনমানসে বিরাজিত এই অসন্তুষ্টির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বিএনপি ক্ষমতায় যায়, চার দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনে ভুমিধ্বস বিজয় লাভ করে। বিএনপি একাই পায় ১৯১টি আসন, বাদবাকী তিন শরীকের ভাগে জুটে ২৩টি আসন। 'একটি নির্বাচনী এলাকায় একটিমাত্র আসন'- বৃটিশ স্টাইলের এই সিস্টেমের ফলে এই বিজয় সম্ভবপর হয়, কারণ জোটের শরীকরা একে অপরের পক্ষে ভোট দেয়। আওয়ামী লীগ পপুলার ভোটের ৪০ শতাংশ পেয়েও আসন পায় মাত্র ৬২টি, যা মোট আসন সংখ্যার ২০.৬৬% ভাগ। (বর্তমানে আওয়ামী লীগের মাত্র ৫৮টি আসন আছে, কারণ একাধিক

আসনে নির্বাচনের কারণে ৪টি আসন তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয়েছে)। (৪)। শাসক বিএনপি এবং এর শরীকরা দুই তৃতীয়াংশের বেশী আসন নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে। (৫)।
নবগঠিত সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিল খুবই উচু, তারা আশা করেছিল এই সরকার নিশ্চয়ই পুর্ববতী সরকারের চেয়ে স্বচ্ছ এবং দুর্ণীতিমুক্তভাবে দেশ চালাবে। ২০০১ সালে নির্বাচনের ঠিক পুর্বক্ষনে বার্লিনভিত্তিক সংস্থা ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ণীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। (৬)। কিন্তু নুতন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরও অবস্থার কোন উন্নতিই লক্ষ্য করা যায় নাই। অধিকন্তু সমাজের সর্বত্র ভায়োলেন্স বিস্তার লাভ করে, যার অধিকাংশই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণপ্রসুত। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (SHED) নামক এক বাংলাদেশী এনজিও স্থানীয় একটি রিপোর্টের সুত্র ধরে জানায় যে এই ভায়োলেন্সের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে দেশের নন-মুসলিম সম্প্রদায়। "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন নির্বাচনের পুর্ব হতেই শুরু হয়, নির্বাচনের পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে"। (৭)। ২০০১ সালের ডিসেম্বারে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যশনাল কতৃক প্রনীত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিল এই আক্রমনের টার্গেট, এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার (১৩ কোটি) দশ পার্সেন্টেরও নীচে নেমে এসেছে। হিন্দুদের মন্দিরগুলি তছনছ করা হয়েছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে এবং বহু হিন্দু রমনী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। (৮)।

এইসব অত্যাচারের সাথে জামাত হয়তো সরাসরি জড়িত ছিল না, তবে সরকার পরিচালনায় জামাতের গুরুত্বপুর্ণ নেতাদের অন্তর্ভুক্তি চরমপন্থীদের মনে এক ধরণের নিরাপত্তার বার্তা পৌছে দেয়। তারা অনুভব করে, ক্ষমতাসীন মন্ত্রীরা তাদের সাথে আছে, যত অপকর্মই করুক শাস্তির ভয় তাদের নেই। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়- বাংলাদেশে মোট ১৫ হাজারের মতো হুজির সক্রিয় সদস্য আছে যাদের মধ্যে প্রায় দু হাজার হার্ড-কোর কর্মী। হিন্দু ও মডারেট মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও সেকুলার সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবিদের উপর পরিচালিত সাম্প্রতিকতম হামলাগুলির জন্যে হুজিকে দায়ী করে। ২০০২ সালের ২রা মে তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস ডিপার্টমেন্ট কতৃক প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয় যে হুজি পাকিস্তানি মিলিট্যান্টদের মদদ দানকারী একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। (৯)।
যদিও আরেকটি পাকিস্তানে রুপান্তরিত হতে বাংলাদেশকে আরও বহু পথ অতিক্রম করতে হবে, তবে ইসলামী শক্তিগুলি যে এদেশে ক্রমবিকাশমান তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ইসলামী চরমপন্থীদের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলছে। ঢাকায় কর্মরত জনৈক বিদেশী ডিপ্লোম্যাটের ভাষায় -"ষাট সত্তরের দশকে বামপন্থীরাই পরিশুদ্ধ নীতিবাদী হিসেবে বিবেচিত হতো সমাজে। আজকাল গ্রামাঞ্চলে তরুন সম্প্রদায়ের রোল মডেল হচ্ছে দাড়ীটুপি ও লম্বা কোর্তা শোভিত নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী মোল্লাগণ"। (১০)।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ হতে ইসলামী জাতীয়তাবাদে উত্তরণঃ

১৯৭১ সালে তদানীন্তন পুর্ব পাকিস্তান পশ্চিমাঞ্চলীয় মুল ভুখন্ড থেকে বিছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পত্তন করে। বৃটিশ ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে একক রাষ্ট্র গঠনের যে তত্ত্ব নিয়ে ভারত ভাগ হয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বের মৃত্যু ঘটে। আওয়ামী লীগ নামক যে দলটি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে দলটির বিকাশ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনের সেকুলার আদর্শকে ধারণ করে। ধর্ম নয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রেরণাদায়িনী শক্তি। ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের বুকে বাংলাদেশ নামক একমাত্র সেকুলার রাষ্ট্রটির জন্ম হয়, যে রাষ্ট্রের অধিকাশ জনগণের ভাষা ছিল বাংলা। রাষ্ট্রটিতে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠি কিংবা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সংখ্যাও ছিল নগন্য। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে সেকুলার হিসেবে জন্ম নিলেও বাংলাদেশের জনমানসে এক ধরণের ইসলামী উপাদান গোড়া থেকেই বিদ্যমান ছিল। তা না হলে পুর্ব পাকিস্তান নামক ভুখন্ডটি সহজেই ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যটির সঙ্গে একীভুত হয়ে যেতে পারত। ধর্মে আলাদা হলেও পশ্চিম বঙ্গবাসীদের মুখের ভাষাও হচ্ছে বাংলা।
শক্তিশালী মিলিটারি ইষ্টাব্লিশমেন্টের হাতে আওয়ামী লীগের পতন হলে বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। লীগ প্রবর্তিত সেকুলার ও অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে প্রতিহত করতে সমর নায়কগণ ইসলামকে ব্যবহার করতে শুরু করেন (চরম বামদের একাংশও অবশ্য এই আলাদা রাষ্ট্র গঠনের

বিরোধীতা করেছিল, তারা বলেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ আসলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদেরই আরেক রূপ মাত্র)। প্রয়াত বাংলাদেশী স্কলার গোলাম কবিরের মতে সত্তরের দশকের মধ্যভাগে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল জিয়া "সেকুলার বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে সাফল্যজনকভাবে ইসলামী বাংলাদেশে রূপান্তর করতে সক্ষম হন"। (১১)। কবির আরও যোগ করেন যে 'সেকুলারিজম' শব্দটিকে প্রায়শই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বাংলাদেশে। সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থাৎ সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ প্রদর্শন। অথচ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেকুলারিজম শব্দটির অর্থ পাল্টে গেছে। সেকুলারিজম পশ্চিমা দেশে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাংলাদেশে তা হয় না। (১২)।
১৯৭১ সালে প্রনীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৪টি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম প্রধান কর্ণারস্টোন ছিল সেকুলারিজম (অপর তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে যথাক্রমে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র, যদিও সমাজতান্ত্রিত অর্থনীতির ছিটেফোটাও দেশটিতে চালু করা হয়নি)। জেনারেল জিয়া সংবিধান হতে সেকুলারিজম বাদ দেন এবং তার নবগঠিত দল বিএনপি'র বিভিন্ন সমাবেশে পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের প্রথা প্রবর্তন করেন। আওয়ামী লীগের পরে বিএনপি'ই এখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। জনমানসে আওয়ামী বিরোধীতা প্রতিষ্ঠা করতে জিয়ার দরকার ছিল একটি ইসলামী প্ল্যাটফর্ম। দেশের ইসলামী শক্তিগুলির সাথে সামরিক বাহিনীর মেলবন্ধন ঘটিয়ে জেনারেল জিয়া তা অর্জন করেন এবং ১৯৮১ সালে নিহত হওয়ার আগ পর্য্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকেন।

এরপর শুরু হয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল হোসেন মোহম্মদ এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-৯০)। তার আমলে ইসলামী শক্তি আরও জোরদার হয়। ১৯৮৮ সালে তিনি ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেন এবং জিয়া প্রবর্তিত ইসলাম-মিশ্রিত জাতীয়তাবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। এরশাদ রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবারকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দেন এবং সেকুলার অপজিশনকে মোকাবেলা করার জন্যে জামায়াতকে পুনর্জীবিত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং দখলদার পাক-বাহিনীকে সাহায্য করে। একাত্তরে পাক-বাহিনীর পরাজয়ের পর জামায়াতের অনেক নেতাকর্মী পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। জিয়ার আমলে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে, সাথে করে নিয়ে আসে মৌলবাদী ধ্যানধারণা। এরশাদের আমলে তারা গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক ফ্যাক্টর হিসেবে আবির্ভূত হয়, এরপর আর তাদের শক্তিকে অবজ্ঞা করার মতো কোন উপায় বাঙালিদের হাতে রইল না।

১৯৯০ সালে প্রচন্ড সরকার বিরোধী আন্দোলনে এরশাদ গদীচ্যুত হন এবং বিভিন্ন অপরাধের দায়ে কারারুদ্ধ হন। তবে এরশাদের বিদায়ে দেশে পুরোনো সেকুলার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলো- তা যেন কেউ ভেবে না বসেন। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জিয়ার বিধবা পত্নী খালেদা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়ীত্ব গ্রহন করেন। খালেদা জিয়ার এই শাসনামলে ইসলামী শক্তিগুলি তাদের প্রভাবকে আরও সংহত করে। ইসলামী শক্তির এই অপ্রতিহত উত্থান জোর ধাক্কা খায় ১৯৯৬ সালে, এই বছর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের ফাউন্ডিং ফাদার শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় দেশের শাসনভার পায়।

এরপরের নির্বাচন ২০০১ সালের অক্টোবরে। এই নির্বাচনের পর চরমপন্থী ইসলামী দলগুলি মাইনরিটি এবং সেকুলার শক্তির উপর প্রকাশ্য হামলা পরিচালনা করে। সরকারের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মতে এই বর্বর আক্রমনের হোতা হিসেবে সবার সামনের কাতারে ছিল হুজি। কথিত হয় যে ওসামা বিন লাদেনের অর্থসাহায্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে এই গ্রুপটির জন্ম হয়। (১৩)। এই নব্য বাংলাদেশী জঙ্গী গ্রুপটির সাথে যে আল-কায়দার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে সে প্রমান মেলে ১৯৯৮ সালে। এই বছরের ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখে বাংলাদেশ জেহাদ আন্দোলনের নেতা ফজলুর রহমান (হুজি সংগঠনটিও তারই আয়ত্বাধীন তখন) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রে সই করেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যান্যরা ছিলেন বিন লাদেন, আইমান আল জওয়াহিরি (মিশরের জেহাদ গ্রুপের নেতা), রিফা'ই আহম্মদ তাহা আকা আবু ইয়াছের (মিশরীয় একটি ইসলামী গ্রুপ) এবং শেখ মীর হামজা (জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের সেক্রেটারি)। (১৪)।

যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে হুজির অন্ততপক্ষে ছয়টি ক্যাম্প আছে। (১৫)। উখিয়া কক্সবাজারের দক্ষিনে একটি ছোট্ট শহর। উখিয়ায় বসবাসরত এক প্রত্যক্ষ্যদশীর বর্ণনা মোতাবেক মিয়ানমার বর্ডারের কাছে এরূপ একটি ক্যাম্প আছে যেখানে শত শত জঙ্গী অবস্থান করছে যাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র বাংলাদেশী, বাদবাকী সবাই আরব অথবা মধ্য কিংবা পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসী। এই জঙ্গীরা গ্রামবাসীদিগকে এই বলে ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে যদি তারা মিডিয়া কিংবা কতৃপক্ষের কাছে এই ক্যাম্পের কথা ফাস করে দেয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। (১৬)।

বাংলাদেশের ইসলামী চরমপন্থীরা সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মনোযোগ পায় ১৯৯৩ সালে। তসলিমা নাসরিন নামক একজন লেখিকা চরমপন্থীদের হুমকির কারনে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। নাসরিন তার লেখায় মান্ধাতা আমলের ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনা করায় উগ্রপন্থীদের কোপানলে পড়েন, তার মাথার দাম ধার্য্য করা হয় ৫ হাজার ডলার। বর্তমানে তিনি ইউরোপে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।
নাসরিনের খোলামেলা নারীবাদী লেখার কারণে অনেক মডারেট মুসলিমও তার উপর বিরক্ত হন। কিন্তু ১৯৯৯ সালে যখন প্রখ্যাত কবি শামসুর রহমানের উপর তিন জঙ্গী হামলা করে, সমস্ত জাতি স্তব্দ হয়ে যায়। শামসুর রহমান খুবই জনপ্রিয় এক কবি, সেকুলার বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে তিনি সমাজে সমাদৃত। (১৭)। শামসুর রহমান হত্যা প্রচেষ্টার তদন্তকালে পুলিশ জঙ্গীদের কাছ থেকে বাংলাদেশী লেখক-বুদ্ধিজীবিদের একটি তালিকা উদ্ধার করে, যে তালিকায় তসলিমা নাসরিনের নামও ছিল। উগ্রপন্থীরা তালিকাভুক্ত লেখক বুদ্ধিজীবিদের "ইসলামের শত্রু" বলে চিহ্নিত করে। (১৮)।
তসলিমা নাসরিন এবং কবি শামসুর রহমানকে হত্যা প্রচেস্টার জন্যে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশন সরাসরি হুজিকে দায়ী করে। যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড মোতাবেক হুজি ১৯৯৯ সালের নভেম্বারে একজন সিনিয়র বাংলাদেশী সাংবাদিককে ছুরিকাহত করে, কারণ উক্ত সাংবাদিক বাংলাদেশী হিন্দুদের করুন অবস্থার উপর একটি তথ্যচিত্র নির্মান করছিলেন। এর পরের বছর (২০০০ সালে) হুজি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। (১৯)।
জামায়াত এবং এর জঙ্গী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের (ICS) প্রধান ঘাটি হচ্ছে দেশের দক্ষিনপুর্বাঞ্চলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমনিতেই যথেষ্ট নাজুক সেখানে। বার্মা সীমান্তের এই দুর্গম অঞ্চলটি হুজিরও প্রধান ঘাটি। সতত পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা এবং দুর্বল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার উপস্থিতির কারণে অঞ্চলটি বহুদিন হতেই চোরাকারবারি, অস্ত্রব্যবসায়ী, জলদস্যু এবং সীমান্তের অপর পাড়ের রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গত এক দশকে এই অঞ্চলে কক্সবাজার মৎস্য বন্দর হয়ে প্রচুর পরিমানে অস্ত্র (বিশেষ করে ক্ষুদ্র যুদ্ধাস্ত্র) চোরাচালান হয়ে এসেছে। এই অব্যাহত অস্ত্র চালানের কারণে দক্ষিনপুর্বের এই অঞ্চলটি সবসময়ই অস্থির ও বিপজ্জনক হিসেবে পরিগনিত হয়ে এসেছে। (২০)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কক্সবাজার আসন হতে বিজয়ী বিএনপি নেতা শাজাহান চৌধুরির বিজয়ের স্থপতি হিসেবে যিনি পরিচিত, তিনি হচ্ছেন "সেই ব্যক্তি যিনি টেকনাফে (সীমান্ত শহর) চোরাকারবার অপারেশনের মুল নেতা বলে কথিত"। (২১)। ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে এখানে বিডিআর নামক এক আধা সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়, রেগুলার আর্মিকে দায়ীত্ব দেয়া হয়নি। শেডের মতে (SHED) স্থানীয় জনগণ এই পদক্ষেপে মোটেও খুশী হয়নি, কারণ বিডিআর বাহিনীর সাথে চোরাকারবারিদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ সর্বজনবিদিত। নির্বাচনে পক্ষপাতমুলক আচরণ করা তাদের জন্যে ছিল খুবই স্বাভাবিক। (২২)।

এই অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের সবচেয়ে হাই প্রোফাইল শিকার হচ্ছেন গোপালকৃষ্ণ মুহুরি। স্থানীয় নাজিরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল এবং একজন সেকুলার মানবতাবাদী ষাট বৎসর বয়স্ক মুহুরি ২০০১ সালের নভেম্বারে নিজগৃহে অতাতায়ীর গুলিতে ঝাঝড়া হয়ে যান। ভাড়াটে খুনীদের সংখ্যা ছিল ৪ জন, তারা সবাই জামায়াত নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য। (২৩)। বাংলাদেশে এই অব্যাহত জঙ্গী উত্থানের ঘটনায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত দারুনভাবে উদ্বিগ্ন। ভারত অভিযোগ করেছে যে ২০০২ সালের জানুয়ারীতে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টার আক্রমনের সাথে বাংলাদেশের হুজি জড়িত ছিল। এ ছাড়া ভারতের উত্তর-পুর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যে নিরানব্বুই সালের মধ্যভাগে যে সিরিজ বোমা হামলা হয়, তার পেছনেও হুজির মদদ রয়েছে বলে ভারত মনে করে। (২৪)।

২০০২ সালের মে মাসে কক্সবাজারের দক্ষিনে ছোট্ট শহর উখিয়াতে ইসলামী মৌলবাদী গ্রুপের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'বাংলাদেশ ইসলামী মঞ্চ' নামের একটি এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। নবগঠিত এই আমব্রেলা সংগঠনটিতে বাংলাদেশী গ্রুপ ছাড়াও বার্মার মুসলিম মাইনরিটি রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার একটি ছোট্ট গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ছাড়া ভারতের আসাম রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি ছোট্ট মুসলিম গ্রুপও এই মোর্চায় অন্তর্ভুক্ত হয় (মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগারস অব আসাম, সংক্ষেপে MULTA)। জুন মাসের মধ্যে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অভিজ্ঞ মুজহিদগণ নবগঠিত মোর্চার সদস্যদের সামরিক শিক্ষাদান শুরু করে। কমপক্ষে দু'টি ক্যাম্পে এই প্রশিক্ষন চলছিল বলে জানা যায়। (২৫)।

রোহিঙ্গাদের দুরাবস্থাঃ

বার্মার (বর্তমান নাম মিয়ানমার) একটি পর্বতবেষ্টিত প্রদেশের নাম আরাকান, অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতমালা দ্বারা বার্মার মুল ভুখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে স্মরনাতীত কাল থেকেই স্বাধীন সত্ত্বা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে প্রদেশটি। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। পুর্বে এই এলাকার বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র পথ ছিল পশ্চিমমুখী। পশ্চিম দিক হতে সমুদ্র পথে এই অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। দশম শতাব্দী হতে ষোড়শ শতাব্দি পর্য্যন্ত আরাকানের পশ্চিম উপকুলে যেসব বিদেশী বনিকদের আগমন ঘটে তাদের সবাই ছিল আরব, মুর কিংবা পারসিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই বনিকদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় রমনী বিয়ে করে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আরাকান রমনীর গর্ভে আরব দেশীয় বনিকদের ঔরসে যে শংকর জাতির উদ্ভব হয়, তারাই আধুনিক রোহিঙ্গা। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ডায়ালেক্টের সাথে প্রচুর আরবি, উর্দু ও ফার্সি শব্দের মিশেল দিয়ে রোহিঙ্গা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। (২৬)।

প্রতিবেশী বৌদ্ধদের সাথে রোহিঙ্গাদের সংঘাতের কথা প্রাচীনকালে কখনও শোনা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৪৩০ সালের পরেও দেখা গেছে যে আরাকান রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও স্বীয় নামের সাথে মুসলিম পদবী যোগ করেছেন। রাজারা যেসব পদক বিতরণ করতেন তার উপর মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি স্বীকৃতিসুচক আরবী বাণী খোদাই করা থাকত। (২৭)। ১৭৮৪ সালে বার্মিজ আক্রমনের পুর্ব পর্য্যন্ত রাজ দরবারে ফার্সি ভাষা চালু ছিল। আরাকানে বার্মিজ প্রভুত্ব স্থায়ী হয় ১৮২৪-২৬ সালে সংঘটিত ইঙ্গাবার্মিজ যুদ্ধ পর্য্যন্ত। এই যুদ্ধে বার্মা দেশের টেনাসেরিম অঞ্চলসহ পুরো আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের করতলগত হয়।

আরাকান বৃটিশ ভারতের অংশে পরিনত হলে সেখানকার সুবিস্তীর্ণ ধানি জমি তদানীন্তন পুর্ব বাংলার মৌসুমি শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চলের হাজার হাজার দিনমজুর কাজের আশায় আরাকানে ভীড় জমায়। এদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। কারণ সেখানকার জনগোষ্ঠির এক উল্লেখ্যযোগ্য অংশ ছিল সমধর্মাবলম্বী মুসলমান, তাদের ভাষাও ছিল এক। সর্বোপরি তৎকালে ভারত হতে আসা অভিবাসীদের প্রতি স্থানীয় আরাকানিদের মনে তখন পর্য্যন্ত কোনপ্রকার বিদ্বেষের জন্ম হয়নি। অথচ একই সময় বার্মার অন্যান্য স্থানে ভারতীয় বংশোদ্ভুত অভিবাসীদেরকে রীতিমত ঘৃনার চোখে দেখা হতো। সম্পুর্ণ বিপরীত চিত্রও দেখা যেত কখনও কখনও। অনেক আরাকানি বৌদ্ধ পুর্ব বাংলায় আগমন করে এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল দু'টির মধ্যে সীমানা বিভেদকারী নাফ নদীটি বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে বরং মিলনের সেতুবন্ধ হিসেবে পরিগনিত হয়।

কিন্তু দিন সব সময় সমান যায় না। ১৯৪৮ সালে ইংরেজরা বার্মা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আরাকানের মুসলিম মাইনরিটি ইস্যু ক্রমেই বিশ্ব পরিমন্ডলে গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় । ২য় মহাযুদ্ধে বার্মার বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম বারের মতো সুস্পষ্ট বিভক্তির সুচনা হয়। বৌদ্ধগণ স্বধর্মী জাপানকে সমর্থন করে, পক্ষান্তরে মুসলমানগণ ইংরেজকে সমর্থন করে। মুসলমানদের মনে এই ভয় ঢুকে যে যুদ্ধশেষে বৃটিশরা চলে গেলে বৌদ্ধরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে তাদের উপর। এই আশংকায় কিছু মুসলমান হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং নিজেদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ভুখন্ডের দাবী করে। বার্মিজ

সেনাবাহিনী অবশ্য এই বিদ্রোহ অনায়াসেই নির্মুল করে ফেলে। আসলে বৌদ্ধ বার্মা কখনই আরাকানি মুসলমানদের সুনজরে দেখে নাই। ১৯৬০ সাল থেকে আরাকানি মুসলমানরা স্বতন্ত্র আইডেন্টিটির জোর দাবী নিয়ে হাজির হয় এবং নিজেদেরকে 'রোহিঙ্গা' নামক এক স্বতন্ত্র জাতি বলে ঘোষণা করে। রোহিঙ্গা টার্মটির মধ্যেই বিতর্কের উপাদান রয়েছে, এর মধ্যে মিশে আছে যেন একটি বৈদেশিক ইথনিক আইডেন্টি। স্থানীয় অধিবাসীরা রোহিঙ্গাদেরকে বার্মার ভুমিপুত্র বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। রোহিঙ্গাদের ধর্ম এবং শারিরিক গঠনও ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে স্বতন্ত্র। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজিত এই মনস্তাত্বিক বিভাজনেরই সুযোগ নিয়েছে সামরিক শাসকরা। দেশটি যখনই কোন রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে, সামরিক শাসকগণ জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে রোহিঙ্গাদেরকে স্কেপগোট হিসেবে ব্যবহার করে।

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে বার্মা সরকার আরাকানে এক অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন নাগা মিন'। সরকার প্রচার চালায় যে অবৈধ বহিরাগতদের বহিস্কার করতেই এই অভিযান। ভারী যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত শত শত সৈন্য আকিয়াবের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হামলা চালায়, গ্রেফতার করে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে। পরবর্তীতে আরাকানের অন্যান্য অঞ্চলেও এইরুপ হামলা পরিচালিত হয় এবং হাজার হাজার রোহিঙ্গা নরনারী সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। জুন মাসের মধ্যে সীমান্ত অতিক্রমকারী লোকের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ২ লাখ। (২৮)। অবৈধ শরনার্থীদের পুরো কমুনিটিই কক্সবাজারের দক্ষিন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে, সমগ্র আশীর দশক ধরে এই অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে অবশ্য রোহিঙ্গাদের অধিকাংশই দেশে প্রত্যাবর্তন করে, তবে কয়েক হাজার বাংলাদেশেই থেকে যাওয়া নিরাপদ বলে মনে করে।

৭৮ সালের এই রোহিঙ্গা সঙ্কটের সময় সৌদি আরবের বিত্তশালী চ্যারিটি সংস্থা রাবেতা আলম আল ইসলামি সাহায্য পাঠানো শুরু করে। উখিয়াতে রাবেতা একটি হাসপাতাল ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। ইতিপুর্বে রোহিঙ্গাদের একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠন ছিল- রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়াটিক ফ্রন্ট বা আরডিএফ (RDF)। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটির জনৈক গ্রাজুয়েট মোহম্মদ জাফর হাবিব ১৯৭৪ সালে এই ফ্রন্ট গঠন করেন। তিনি ছিলেন আরাকানের বুথিডুয়াং এলাকার অধিবাসী। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান, তবে তার এই আবেদন খুব একটা সাড়া জাগাতে পারেনি। তার অধীনে একটি ছোট্ট গেরিলা দল ছিল, যারা বাংলাদেশের ভেতর হতে বর্ডারের অপর পাড়ে অপারেশন চালাত।
১৯৮০ সালের মধ্যে রোহিঙ্গাদের উগ্রপন্থী গ্রুপগুলি আরডিএফ পরিত্যাগ করে নুতন এক জঙ্গী সংগঠন গঠন করে, 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' বা আরএসও (RSO)। এই অর্গানাইজেশনের নেতৃত্ব দেন আরাকানের এক মেডিকেল ডাক্তার, নাম মোহম্মদ ইউনুছ। আরএসও শীঘ্রই রোহিঙ্গাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সুদৃঢ় ধর্মীয় আদর্শ গ্রহন করার ফলে আরএসও'র সাথে বাংলাদেশের এবং মুসলিম বিশ্বের সমমনা ধর্মীয় গ্রুপগুলির সখ্যতা নিবিড় হয়ে উঠে। আরএসও'র সাথে সখ্যতা স্থাপনকারী দলগুলি হচ্ছে জামায়াতে ইসলামি (বাংলাদেশ ও পাকিস্তান), গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিজবুল ইসলাম (আফগানিস্তান), হিজবুল মুজাহেদিন (কাশ্মীর), আঙকাতান বেলিয়া সা মালয়েশিয়া (AMIM) এবং ইসলামিক ইয়থ অর্গানাইজেশন অব মালয়েশিয়া। বাংলাদেশ-বার্মা বর্ডারের কোন কোন আরএসও ক্যাম্পে আফগান প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষন দিতে দেখা গেছে; পক্ষান্তরে প্রায় শ'খানেক রোহিঙ্গা বিদ্রোহী আফগানিস্তানের খুস্ত্ প্রদেশে হিজবুল মুজাহেদিনদের সাথে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়। (২৯)।

আরএসও'র প্রধান মিলিটারি ক্যাম্পটি ছিল উখিয়ায়, রাবেতা নির্মিত হাসপাতালের পাশে। ইতিমধ্যে আরএসও প্রচুর পরিমানে অস্ত্র সংগ্রহ করে ফেলে যার মধ্যে ছিল আরপিজি-২ রকেট লাঞ্চার (চায়না), হালকা মেশিন গান, একে-৪৭ এ্যাসল্ট রাইফেল, ক্লেমোর মাইন এবং প্রচুর পরিমানে বিস্ফোরক। এই সব সামরিক সরঞ্জাম তারা থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া বর্ডারের কাছে অবস্থিত থাই শহর আরানিয়াপার্থেটের প্রাইভেট অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। আশির দশকে আরানিয়াপার্থেট শহরটি অত্র অঞ্চলের গেরিলাদের অস্ত্র ক্রয়ের একটি বৃহৎ বাজার হিসেবে সুপরিচিত ছিল। যেসব ভিয়েতনামী সৈন্য কম্বোডিয়ায় প্রতিরক্ষা যুদ্ধে ব্যপৃত ছিল, তাদের জন্যে চীন হতে নিয়মিত অস্ত্রের চালান পাঠানো হতো।

এইসব চালান হতে কিছু অস্ত্র ছিটকে আরানিয়ার অস্ত্র বাজারে ঢুকে যেত, সেখান হতে যে কেউ নগদ পয়সায় তা সংগ্রহ করতে পারত। (৩০)।

বার্মা বর্ডারে আরএসও'র সামরিক স্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশী মিডিয়াগুলি তখন বিস্তারিত কভারেজ দেয়। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পারে যে এইসব ক্যাম্পে শুধু যে আরএসও জঙ্গীরাই প্রশিক্ষন নেয় তা নয়, চিটাগাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিবির কর্মীও এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে মডারেট ছাত্রদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাস যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। (৩১)। প্রকৃত সত্য এই যে আরএসও সদস্যরা বার্মার অভ্যন্তরে খুব কম যুদ্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে। এইসব ক্যাম্পে ভিডিও চিত্র পরবর্তীতে আফগানিস্তানে প্রদর্শনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে তা সিএনএন টেলিভিশন চ্যানেলের হস্তগত হয়। ২০০২ সালের আগস্টে সিএনএন সেগুলি বিশ্বব্যপী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। টেপগুলিতে আরবী হরফে মিয়ানমার শব্দটি লেখা থাকায় সেগুলি যে বাংলাদেশে চিত্রায়িত হয়েছে তা কেউ বুঝতে পারেনি। দর্শকরা মনে করে নিশ্চয়ই বার্মার ঘটনা এগুলি। (৩২)।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের মধ্যে মডারেট কিছু গ্রুপও ছিল। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামি ফ্রন্ট (ARIF)। বিলুপ্ত আরপিএফ এবং আরএসও হতে ভেগে আসা কিছু দলছুট সদস্য নিয়ে ১৯৮৬ সালে গ্রুপটি গঠিত হয়। রেঙ্গুনে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন আইনজীবি নুরুল ইসলাম এই ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা। তবে গ্রুপটি কখনই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি; মুষ্টিমেয় ডজনখানেক যোদ্ধা যাদের সম্বল ছিল পুরোনো মডেলের বৃটিশ নির্মিত ৯এমএম ষ্টার্লিং সাব মেশিনগান, কিছু থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও গোটাকয়েক এম-১৬ এ্যাসল্ট রাইফেল। (৩৩)।

সমগ্র আশির দশক এবং নব্বুইর দশকের গোড়ার দিকে আরএসও'র পরিধি অনেক বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় অভুতপুর্ব প্রচারণা পায়। ফলে বার্মা সরকার বর্ডার এলাকা হতে আরএসও'র উৎপাৎ নির্মুল করতে শক্তিশালী অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বারে বার্মার সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের মিলিটারি আউটপোস্টে আক্রমন চালায়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯২ সালের এপ্রিলের মধ্যে আড়াই লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা নরনারী আরাকান হতে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

কক্সবাজারের দক্ষিনে অস্থায়ী ক্যাম্পে এইসব রোহিঙ্গা রিফিউজিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের আবেদনে জাতিসঙ্ঘের শরনাথী বিষয়ক হাই কমিশনার (UNHCR) ক্যাম্পগুলি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহন করে এবং শরনার্থীদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে বার্মা সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যায়। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে প্রিন্স খালেদ বিন সুলতান বিন আব্দুল আজিজ (একানব্বুইর প্রথম গালফ যুদ্ধে যিনি সৌদি কন্টিনজেন্টের কমান্ডার ছিলেন) ঢাকা সফরে আসেন। এই সফরে তিনি বার্মার বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘ কতৃক 'ডেজার্ট ষ্টর্ম' ষ্টাইলের অপারেশন পরিচালনার পরামর্শ দেন- "কুয়েত মুক্ত করতে (জাতিসঙ্ঘ) যা করেছিল ঠিক সেইরুপ"। (৩৪)।

সে রকম অবশ্য কখনও ঘটেনি। তবে জাতিসঙ্ঘের চাপে বার্মা সরকার অধিকাংশ শরনাথীকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়। তবে কক্সবাজারের ক্যাম্পসহ সীমান্ত অঞ্চলের দুটি ক্যাম্পের ২০ হাজারের মতো শরনাথী আর ফিরে যায়নি। এটি ছিল ইউএনএইচসিআর এর হিসাব। এই হিসাবের বাইরেও যে বহু রোহিঙ্গা বাংলাদেশেই থেকে গেছে তা প্রায় নিশ্চিত। থেকে যাওয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা কম করে হলেও এক লাখ থেকে দেড় লাখের মত হবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উগ্রপন্থীরা অধিকারহারা এইসব রোহিঙ্গা তরুনদের অসহায়ত্বকে ভালই কাজে লাগিয়েছিল। আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে কামানের খাদ্য (ক্যানন ফডার) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। করাচি ভিত্তিক সংবাদপত্র 'উম্মা'র কাছে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন বলেছিলেন (২৮শে সেপ্টেম্বার, ২০০১)- "পৃথিবীর সকল প্রান্তেই জেহাদি শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, বসনিয়া থেকে সুদান, কাশ্মীর থেকে বার্মা- সর্বত্র"। (৩৫)। খুব সম্ভবত তিনি বাংলাদেশ-বার্মা বর্ডারের রোহিঙ্গাদের প্রতিই ইংগিত করেছিলেন সেদিন।

রনাঙ্গানে সবচেয়ে বিজ্জনক কাজটিতে রোহিঙ্গাদের নিয়োগ করা হতো, যেমন মাইনক্ষেত্র পরিস্কার করা কিংবা ভার বহন করা। এশিয়ান ইন্টেলিজেন্স সোর্সের বর্ণনা মতে প্রতিটি রোহিঙ্গা রিক্রুটকে যোগদানের সময় ৩০ হাজার বাংলাদেশী টাকা (৫২৫ ডলার) দেয়া হতো, এরপর প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা (১৭৫ ডলার) করে বেতন দেয়া হতো। যুদ্ধে মারা গেলে নিহতের পরিবারকে ১ লাখ টাকা (১৭৫০ ডলার) ক্ষতিপুরণ দেয়া হতো। (৩৬)। রিক্রুটদেরকে নেপাল হয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। পাকিস্তানে প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের পর তাদেরকে আফগানিস্তানে পাঠানো হতো। বাংলাদেশ হতে কতজন বাংলাদেশী

এবং রোহিঙ্গা আফগান যুদ্ধে গিয়েছিল তার সংখ্যা অজানা, তবে তা যে একটি গুরুত্বপুর্ণ সংখ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ কাশ্মীর এমনকি সুদুর চেচনিয়া পর্য্যন্ত গিয়েছে এবং সেখানকার ইসলামী জঙ্গীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। (৩৭)। ২০০১ সালের ডিসেম্বারে সিএনএন এর কাছে দেয়া এক সাক্ষাতকারে আমেরিকান তালেবান যোদ্ধা জন ওয়াকার লিন্ড বলেন যে আফগানিস্তানে তিনি যে আনছার ব্রিগেডটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আল-কায়েদা সেই ব্রিগেডটিকে ভাষাভিত্তিক তিন গ্রুপে ভাগ করতে নির্দেশ দেয়- "বাংলা, উর্দু এবং আরবী"। এতে প্রমান হয় যে বাংলাভাষী অংশটি (বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা) আনছারদের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ ছিল। (৩৮)। ২০০২ সালের প্রথম দিকে আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী ডঃ আব্দুল্লাহ পশ্চিমা সাংবাদিকদের বলেন- "আমরা একজন মালয়েশিয়ান এবং একজন কিংবা দু'জন বার্মিজকে গ্রেফতার করেছি"। (৩৯)।

২০০১ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের উপর ক্র্যাকডাউন করে, তাদের ক্যাম্পগুলি গুটিয়ে ফেলা হয়। খুব সম্ভবত বার্মার সাথে সম্পর্কোন্নয়নের জন্যেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। শত শত রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়, স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিতে অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের সাথে রোহিঙ্গাদের সংশ্লিষ্টতার কাহিনী ফলাও করে ছাপা হতে থাকে। রোহিঙ্গা নেতারা এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলে যে রোহিঙ্গারা নয়, বরং স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠিই উক্ত অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্যে দায়ী, এইসব সন্ত্রাসীদের সাথে সরকারের উচু মহলের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। সে যাই হোক, রোহিঙ্গাদেরকে ক্যাম্পগুলি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, সেই ক্যাম্পগুলি যেখানে হুজি এবং বাংলাদেশী ইসলামী সংগঠনগুলি এতদিন আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল উখিয়ায় রাবেতা নির্মিত হাসপাতালের পাশের ক্যাম্পটি যেখানে সিএনএন প্রদর্শিত টেপটি নব্বুই সালের গোড়ার দিকে তৈরী হয়েছিল। (৪০)।

জামায়াতের উত্থান এবং মাদ্রাসার ভুমিকাঃ

জামায়াতে ইসলাম দলটি ১৯৪১ সালে মাওলানা আবুল আলা মওদুদি কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মুল প্রোথিত রয়েছে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি 'দারুল উলুমে'। প্রতিষ্ঠানটি শাহরানপুর জেলার দেওবন্দে অবস্থিত, বর্তমানে এটি ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত। দেওবন্দ মাদ্রাসা নামেই এর বহুল পরিচিতি। বৃটিশ ইন্ডিয়ায় যখন দেওবন্দীদের উত্থান, তখন এটি মোটেও প্রতিক্রিয়শীল কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাড়ায়। শোষিত এবং পশ্চাদপদ মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রগতির পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়েছিল। (৪১)। কিন্তু ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবস্থা পাল্টে যায়। পশ্চিম ও পুর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র নুতন নুতন দেওবন্দী মাদ্রাসার সৃষ্টি হতে থাকে যেগুলির পরিচালনায় ছিল অর্ধশিক্ষিত মোল্লাগণ। পাকিস্তানী সাংবাদিক আহম্মদ রশীদের ভাষ্যমতে "সংস্কার আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেওবন্দী-মুভমেন্টের সুচনা হয়েছিল, এইসব অর্ধশিক্ষিত মোল্লাগণ সেখান হতে বহু দুরে সরে যায়"। (৪২)। পরবর্তীকালে দেওবন্দী ব্রান্ডের ইসলাম আর ধর্মীয় উগ্রবাদ সমার্থক হয়ে দাড়ায়। আশির দশকে এবং নব্বুইর দশকে গোড়ার দিকে আফগানিস্তানে যে ভয়ংকর তালেবান শক্তির উত্থান (তালিবান শব্দের অর্থ ইসলামী ছাত্র) ঘটে, তাদের সবাই ছিল এইসব দেওবন্দী মাদ্রাসার ছাত্র।

জন্মের পর থেকেই জামায়াত ইখ্ওয়ানে মুসলেমুন বা মুসলিম ব্রাদারহুড আইডিয়ায় অনুপ্রানিত। মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনের জন্ম ১৯২৮ সালে মিশরে, এর উদ্দেশ্য বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে একত্র করে একটি ইসলামিক বিপ্লব ঘটানো এবং একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করা। (৪৩)। সেই আদর্শের আলোকে ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম হলো, কিন্তু তার মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতীয়মান হলো। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গীরা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের পক্ষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে। জামায়াত নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল আব্দুল কাদের মোল্লা যে ১৯৭১ সালে "মীরপুরের কসাই" (বুচার অব মীরপুর) নামে পরিচিত হয়েছিল। (৪৪)। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক, এত কলঙ্কজনক অতীত সত্বেও তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা দেয়া হয় এবং ২০০২ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি নিউ ইয়র্ক শহরে ভিজিট করেন। ১৯৭১ সালে তাকে এবং অন্যান্য জামায়াত নেতাদেরকে

তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে, কিন্তু পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বিচার করা আর কোনদিন হয়ে উঠেনি।

জিয়া এবং এরশাদের আমলে তাদেরকে দেশে ফিরে আসার আমন্ত্রন জানানো হয়। বিশেষ করে এরশাদকে তারা নিজেদের আদর্শিক স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে বিবেচনা করে। এটা খুবই কৌতুককর একটি বিষয়, কারন এরশাদ একজন প্লেবয় হিসেবে পরিচিত। কোনপ্রকার ধর্মীয় মুল্যবোধ তার কোনকালেই ছিল না। এরশাদ দেশে অনেকগুলি ইসলামিক রিফর্ম চালু করেন, তিনি আওয়ামী লীগের কাউন্টার হিসেবে জামায়াতকে ব্যবহার করেন। পুর্বসুরী জিয়ার মতো তিনিও মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত করতে একটি সুদৃঢ় আদর্শিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সমস্যা ছিল এই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের ভুমিকায় জনগণের মধ্যে তাদের কোন গ্রহনযোগ্যতা ছিল না। তবে এই অসুবিধা শীঘ্রই কেটে যায়। নুতন প্রজন্ম আসে, মাদ্রাসাগুলিতে জামায়াতের আদর্শ শেখানো হতে থাকে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে জ্যামিতিক হারে প্রসারিত হতে থাকে জামায়াতের প্রভাব।

বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্রপীড়িত দেশে স্কুল-কলেজের সেকুলার শিক্ষা সকলের কাছে সহজলভ্য নয়, এই ঘাটতি পুরণ করতে এগিয়ে এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। আজ বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা মোট ৬৪ হাজার। এদের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। আলিয়া মাদ্রাসাগুলি সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং কিছুটা হলেও সেখানে সরকারের কন্ট্রোল রয়েছে। পক্ষান্তরে দারছ-ই-নিজামি বা দেওবন্দী ষ্টাইলের মাদ্রাসাগুলির উপর সরকারের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রন নাই। আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ কোরান-হাদিসসহ ইসলামী সাবজেক্টের পাশাপাশি ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমুহও পড়তে পারে। কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা ছাত্রদের সাথে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্ররাও সরকারী-বেসরকারী চাকুরির জন্যে আবেদন করতে পারে। ১৯৯৯ সালের হিসেব মতে বাংলাদেশে এই ধরণের মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৭১২২টি। (৪৫)।

দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য দেওবন্দী বা কওমী মাদ্রাসাগুলিতে আধুনিক বিষয়াদি পড়ানোর কোন সুযোগ নেই, সেখানে শুধুমাত্র ট্রাডিশনাল ইসলামী বিষয়ই পড়ানো হয়। ভাষার মধ্যে পড়ানো হয় শুধুমাত্র আরবী, ফার্সি ও উর্দু (পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা)। এখান থেকে পাশ করার পর ছাত্ররা কোন মেইনষ্ট্রীম প্রফেশনে যোগদান করতে পারে না। মসজিদ ও মাদ্রাসা ছাড়া এদের কর্মসংস্থানের আর কোন সুযোগ নেই। এদের অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশী জার্নালিষ্ট সালাহউদ্দিন বাবর লিখেছেন- "পাশ করার পর মুলধারার জীবন ও জীবিকার সাথে সংগ্রাম করার কোন অস্ত্র এদের হাতে থাকে না। সুযোগ সন্ধানীরা এর পুরো সুযোগ নেয়, আধুনিক মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠার পরিবর্তে ছাত্ররা ইসলামী সেন্টিমেন্টে জারিত হয়ে ধর্মীয় চরমপন্থী হিসেবে গড়ে উঠে"। (৪৬)।
এই ধরণের মাদ্রাসা শিক্ষার অনিবার্য্য ফল যা হবার তাই হয়েছে, জামায়াতের অভাবনীয় উত্থান ঘটেছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে অবশ্য জামায়াত খুব একটা ভাল করতে পারেনি, ৮.৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে মাত্র তিনটি সিট পেয়েছিল। (৪৭)। পার্টির সুনাম রক্ষার্থে এবং দেশের অধিকাংশ জনগণ শারিয়া আইন প্রবর্তনের বিপক্ষে এই বিবেচনায় জামায়াতের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোও খুব সাধানে রচনা করা হয়েছিল তখন। ২৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত মেনিফেষ্টোর ১৮ পৃষ্ঠাই ছিল নানাবিধ লোভনীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে পরিপুর্ণ, জামায়াতের রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যয় ব্যয়িত হয়েছিল মাত্র ৫ পৃষ্ঠা। দলটি জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে ক্ষমতা পেলেও তারা চুরির জন্যে হাত কাটা, ব্যভিচারের জন্যে পাথর ছুড়ে হত্যা করা কিংবা সুদ হারাম করবে না, অন্তত এত তাড়াতাড়ি নয়। শেডের বর্ণনা অনুযায়ী এই মেনিফেষ্টোতে "অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল দারিদ্র দুরীকরণ, ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা রোধকরণ এবং এর মাধ্যমে জনগণকে ইসলামের স্পিরিট সম্পর্কে সচেতন করা। এভাবে ধাপে ধাপে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা হবে"। (৪৮)।

কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াত দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এর জঙ্গী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির আরও সাহসী আরও সক্রিয় হয়ে উঠে। হুজি'র মতো শিবিরের সদস্যদেরও অধিকাংশ আসে দেওবন্দী মাদ্রাসাগুলি হতে। অতিরিক্ত হিসেবে শিবিরের ছিল ভাল আন্তর্জাতিক কানেকশন। শিবির 'ইন্টারন্যশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব ষ্টুডেন্ট

অর্গানাইজেশনে'র একজন সদস্য। 'ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম ইয়থের'ও সদস্য শিবির। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম চরমপন্থী গ্রুপগুলির সাথে শিবিরের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে (যেমন পাকিস্তান, মিডল ইষ্ট, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশগুলির ধর্মীয় উগ্রপন্থী গ্রুপ)। বাংলাদেশের ভেতরে অনেকগুলি বোমা হামলা এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে বেশকিছু হত্যার পিছে শিবিরের হাত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

২০০১ সালের এপ্রিলের ৭ তারিখে আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের দু'জন কর্মী শিবির সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। উক্ত সালেরই জুন মাসের ১৫ তারিখে নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে বোমা হামলায় নিহত হয় ২১ জন, আহত হয় ১০০ জনেরও বেশী। এর দু সপ্তাহ পর এই হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এক শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে। (৪৯)।

বহুদিন যাবৎ জামাতের নেতৃত্বে ছিলেন গোলাম আজম। জিয়ার আমলে তিনি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ২০০০ সালে গোলাম আজম পদত্যাগ করলে মতিউর রহমান নিজামি জামাতের নেতা হন। তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দেশে আপত্তির ঝড় বয়ে যায়, কারণ নিজামি দেশে একজন যুদ্ধপরাধী হিসেবে পরিচিত। একাত্তরে তিনি আল বদর বাহিনী নামক এক কুখ্যাত ঘাতক বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন যার সদস্যরা সেই সময় প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবিসহ বহু হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। জামায়াতের নেতা হিসেবে নিজামির নিযুক্তির বিরুদ্ধে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধারা বিক্ষোভ করেন এবং তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। (৫০)। ২০০১ সালের অক্টোবরে নিজামি বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপুর্ণ মন্ত্রনালয় – কৃষি মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী হন। তার সহকারী আলী আহসান মুজাহিদি হন সমাজ-কল্যান মন্ত্রী।

যুক্তরাষ্ট্রের নাইন-ইলেভেন ঘটনার সময় বাংলাদেশে কেয়ার-টেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন চলছিল। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া উভয়েই এই হামলা এবং হতাহতের ঘটনার নিন্দা জানান এবং নির্বাচিত হলে আল কায়েদার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের আকাশপথ, বন্দর ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতি দেন। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের এক কুটনীতিক নাইন ইলেভেনের হামলাকে "ইসলামের অবমাননা....মানবতার বিরুদ্ধে আক্রমন" বলে অভিহিত করেন। (৫১)।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র ব্যাপারে জামায়াতের অবস্থান ছিল অন্য বড় দলের তুলনায় স্পষ্ট বিপরীতমুখী। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনতিকাল পরেই জামায়াত "আমেরিকা পরিচালিত যুদ্ধের নির্দোষ শিকারদের" সাহায্যকল্পে একটি তহবিল গঠন করে। এই তহবিলের হিসেব দিতে গিয়ে জামায়াত ঘোষনা করে যে ২০০২ সালের মার্চ মাসে তহবিল সংগ্রহের কাজ স্থগিত হওয়ার পুর্বে এই তহবিলে মোট এক কোটি বিশ লাখ টাকা (২১০,০০০ ডলার) সংগৃহীত হয়েছিল। সংগ্রহকৃত এই ফান্ড পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান রিফিউজিদের সাহায্যকল্পে পাঠানো হবে বলে জামায়াত ঘোষণা করে। (৫২)।

মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে যোগাযোগঃ

২০০১ সাল। ডিসেম্বার ২১ তারিখের রাত্রিবেলা এম.ভি মক্কা নামক একটি জাহাজ চিটাগাং বন্দরে এসে নোঙর করে। এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে কান্দাহারের তালেবান ঘাটির পতন হয়েছে। জাহাজে ছিল কয়েক হাজার তালেবান এবং আল কায়দা যোদ্ধা, তাদের সাথে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ। অন্ধকারের চাদরে আবৃত হয়ে তারা জাহাজ থেকে নামে এবং অপেক্ষমান বাস এবং লরিতে উঠে দক্ষিনপুর্বাঞ্চলের বর্ডার এলাকায় হারিয়ে যায়। (৫৩)।

এটি ছিল খুবই গোপন একটি মিশন, কিন্তু স্থানীয় কিছু এনজিওর মাধ্যমে সংবাদটি ফাস হয়ে যায়। উপরন্তু পরের বছর (২০০২) সেপ্টেম্বারের ২৩ তারিখে ঢাকায় সাতজন বিদেশী সাহায্য সংস্থার কর্মী গ্রেফতার হয়। প্রাথমিকভাকে ঢাকা পুলিশ বলে যে লিবিয়া, আলজেরিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনের এই নাগরিকদেরকে শিশু পাচারের সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের সকলেই আল হারামাইন

ইসলামিক ইনস্টিটিউট (AHII) নামক একটি সৌদি সাহায্য সংস্থার কর্মচারি। আল হারমাইন সংস্থাটি বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করে ১৯৯২ সালে, দক্ষিনপুর্বাঞ্চলের রোহিঙ্গা শরনার্থীদের জন্যে কাজ করতে। অল্পদিনেই সংস্থাটি বাংলাদেশের সর্বত্র তাদের কার্য্যক্রম বিস্তৃত করে ফেলে। তিনটি এতিমখানা ও ৬০টি মাদ্রাসা পরিচালিত হতো হারামাইনের অর্থ ও তত্ত্বাবধানে। (৫৪)।

ঢাকাবাসীদের মধ্যে যারা উক্ত সাত বিদেশীর গ্রেফতার ও তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিল, তারা সাক্ষ্য দেয় যে হারামাইন পরিচালিত সংস্থাগুলির ছাত্ররা নিয়মিতভাবে সামরিক প্রশিক্ষন গ্রহন করতো। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলির ধারণা- এম.ভি. মক্কায় চড়ে যে সমস্ত লোক আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছিল, গ্রেফতারকৃত এই সাত ব্যক্তি তাদের অন্যতম, পরবর্তীতে বাংলাদেশে অপারেশন চালানোর জন্যেই তারা আল-হারামাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। (৫৫)। কতৃপক্ষ যথারীতি এই অভিযোগ অস্বীকার করে। এটি এখনও পরিস্কার নয় যে অতি-উৎসাহী কিছু পুলিশ কর্মকর্তার ভুলের ফলেই এই গ্রেফতার পর্ব মঞ্চস্থ হয়েছিল কিনা। কারণ এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি মক্কার আগমন পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়া ব্যতিরেকে ঘটতে পারে না।

ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে সেপ্টেম্বার হামলার পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেন, তিনি এমনকি তার দেশের মাটি হতেই আফগানিস্তানের আল কায়দা ও তালেবান ঘাটিতে আক্রমন করার অনুমতি দেন। পাকিস্তানের পক্ষে এই আচরণ একেবারে এবাউট টার্নই বলা চলে, কারণ মধ্য নব্বুইতে তালেবান আন্দোলন সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক ছিল আইএসআই। আল কায়দার সাথে আইএসআই'এর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ব্যপক। মোশাররফ আইএসআইকে ঢেলে সাজান, তবে কাজটি তাকে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে করতে হয়। যখন এই পর্ব চলছিল, শত শত তালেবান ও আল কায়দা অপারেটর পলাতক অবস্থায় পাকিস্তানে। পাকিস্তানের জন্যে এটা খুবই বিব্রতকর একটি অবস্থা। এটা এখন পরিস্কার যে আইএসআই তার বাংলাদেশী কাউন্টারপার্ট ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এই সব অবাঞ্ছিত অতিথিদের একটা অংশ বাংলাদেশে চালান করে দেয়। (৫৫)।

এই প্রক্রিয়ায় মিলিটান্টদেরকে নিরাপদ দুরত্বে সরিয়ে দিয়ে বোতলবন্দী করে ফেলা হয়েছিল কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসসমুহের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এই ঘটনায় তা প্রমান করে। তবে বাংলাদেশী ইসলামিক মিলিট্যান্ট গ্রুপগুলির সাথে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রুপগুলির সাথে এর চেয়ে বেশী সম্পর্ক রয়েছে। বোতলবন্দী থিওরী মেনে নিলেও এটা অসম্ভব যে নুতন ভুমিতে এসে এইসব হার্ডকোর জঙ্গীরা তাদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সুবোধ বালকটির মতো চুপচাপ বসে থাকবে। হাজার হলেও তারা পশ্চিমা কাফেরদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে এবং নুতন যে দেশে তারা এসেছে জিহাদ করার বিস্তর সুযোগ রয়েছে সেখানে। রোহিঙ্গাদের সাথে মিলে তারা মিয়ানমারে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, বাংলাদেশে ঘাটি গাড়া ভারতের উত্তর পুর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে মিলে আসামসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আরও বেশী করে সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনা করতে পারে। ২০০২ সালের মে মাসে উখিয়ায় যখন 'বাংলাদেশ ইসলামী মঞ্চ' নামক সংগঠনটির সৃষ্টি হয়, সেখানে রোহিঙ্গা এবং আসামের এমইউএলটিএ (MULTA) উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিল ভারতীয় অরিজিনের বাইরের জঙ্গীরাও (আরব কিংবা মধ্য এশিয়া বংশোদ্ভুত)। নয়টি সদস্যগ্রুপের কার্য্যক্রম সমন্বিত করতে একটি 'জিহাদ কাউন্সিল'ও গঠিত হয় ঐ সভায়।

বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বিচার করতে গেলে এই গ্রুপগুলির কর্য্যক্রমকে হয়তো ছোট এবং গুরুত্বহীন বলে মনে হতে পারে এবং বিগত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে ক্রমাগত ইসলামাইজেশনের পরেও দেশটির সেকুলার শিকড় এখনও অটুট আছে বলে আপাত দেখা যায়। তবে কাফেরদের উপর আক্রমনের ইস্যুতে জঙ্গীরা ক্রমশই অধিকতর সাহসী ও উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের মতো একটি অতীব সহনশীল সোসাইটিতে এটি খুবই উদ্বেগের বিষয়। এবং এও মনে রাখতে হবে যে উগ্রপন্থীদের সংখ্যা কয়জন সেটি কোন বিষয় নয়, বিষয় হলো তারা কতটা সুসংগঠিত এবং

নিবেদিতপ্রাণ। সুসংগঠিত এবং নিবেদিতপ্রাণ ছোট্ট একটি গোষ্ঠিই আতঙ্ক ও সন্ত্রাস বিস্তারের জন্যে যথেষ্ট।

মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হতে আগত অভিজ্ঞ জঙ্গীদের উপস্থিতিই বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। দেশে বিশেষ করে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় ক্ষুদ্র যুদ্ধাস্ত্রের বিস্তারও কম উদ্বেগজনক নয়। মনে রাখতে হবে যে প্রতি বছর লাখ লাখ তরুন মাদ্রাসা থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বেরুচ্ছে যে মাদ্রাসাগুলি পরিচালিত হচ্ছে উগ্রবাদীদের দ্বারা। উগ্রবাদী শিক্ষার বদৌলতে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে কাফেরদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে বাধ্য। এস্থলে ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ টানা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও এই দেশটিকে একটি মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অর্থনৈতিক ধ্বস এবং রাজনৈতিক ক্রাইসিস ইন্দোনেশিয়ায় জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটিয়েছে। মৌলবাদীদের চোখে জাতীয় গর্ব আর ধর্মীয় মৌলবাদ সমার্থক, তারা মনে করে কুশাসন, বিশৃঙ্খলা আর দুর্ণীতিগ্রস্থ জাগতিক রাজনীতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে ধর্মের মৌলবাদী ধ্যানধারনায় আশ্রয়গ্রহন। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি তাই সাবধানী নজর রাখা জরুরী। এর বিশেষ কারণ এই যে জঙ্গীবাদ উত্থানের প্রসঙ্গটি সামনে এলেই বাংলাদেশ সরকার সবসময়ই প্রবলভাবে তা অস্বীকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর অর্থ এই দাড়ায় যে চরমপন্থা এবং উগ্রবাদ বিস্তার রোধ করতে সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক নয়।

পরিশিষ্ট-১
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ইসলামী গ্রুপ

জামায়াতে ইসলামী (JeI)ঃ

জামায়াতে ইসলামী একটি রাজনৈতিক দল বৃটিশ আমলে যার সুচনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দল পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এর অনেক নেতাকর্মী পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। এর আমীর গোলাম আজম একাত্তরে পালিয়ে যায় এবং কয়েক বছর পর পুনরায় বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ২০০০ সালের ডিসেম্বারে পার্টির নুতন আমির হন মতিউর রহমান নিজামি, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একজন গুরুত্বপুর্ণ মন্ত্রী।

ইসলামী ছাত্র শিবির (ICS)ঃ

জামায়াতে ইসলামীর যুব সংগঠন, ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭৯ সালে এটি ইন্টারন্যশনাল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সদস্য হয়। ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম ইয়থেরও সদস্য এটি।

ইসলামী ঐক্য জোট (IOJ)ঃ

একটি ক্ষুদ্র ইসলামী দল, ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি'র সাথে ৪ দলীয় কোয়ালিশন করে এবং পার্লামেন্টে ২টি আসন পায়।

হরকতুল জিহাদ আল ইসলামি (HuJI)ঃ

বাংলাদেশের প্রধান জঙ্গী সংগঠন, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর বর্তমানে প্রায় ১৫,০০০ সদস্য আছে, নেতার নাম মাওলানা শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ, বাড়ী চট্টগ্রাম। প্রধানতঃ মাদ্রাসাগুলি হতে হুজি এর সদস্য সংগ্রহ করে, ২০০১ সাল পর্য্যন্ত সদস্যরা নিজেদেরকে বাংলাদেশের তালেবান বলে পরিচয় দিত। পশ্চিম বাংলা এবং আসামের মুসলিম সংগঠনগুলির সাথে হুজির ব্যপক যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক হুজির উপদেষ্টা কাউন্সিলের একজন মেম্বার।

জিহাদ মুভমেন্টঃ

১৯৯৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ওসামা বিন লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে ফতোয়া দেয়, সেই ফতোয়ায় ওসামার সাথে যুগ্ম-স্বাক্ষরদাতারা হচ্ছেন মিশরের দুই ধর্মীয় নেতা, পাকিস্তানের একজন এবং বাংলাদেশের ফজলুর রহমান নামক এক ব্যক্তি যিনি নিজকে "লিডার অব দ্য জিহাদ মুভমেন্ট অব বাংলাদেশ" নামে পরিচয় দেন। মনে হয় যে এটি কোন স্বতন্ত্র সংগঠন নয়, বরং বাংলাদেশের কয়েকটি ইসলামী গ্রুপের যৌথ নাম। এদের মধ্যে হুজিকেই সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী বলে মনে করা হয়ে থাকে।

আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ARNO)ঃ

মিয়ানমারের একটি জঙ্গী সংগঠন, ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এদের লক্ষ্য আরকানে একটি স্বাধীন মুসলিম 'রাখাইন' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এদের ঘাটি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলে।

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO)ঃ

১৯৯৯-২০০০ সালে ভেঙে যাওয়া আরনো'র একটি ফ্যাকশন, জামায়াতে ইসলাম ও শিবিরের সাথে ঘনিষ্ট। নব্বুইর দশকে সীমান্ত জুড়ে আরএসও'র যে প্রশিক্ষন ক্যাম্পগুলি ছিল, সেখানে শিবির ক্যাডাররা গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষন নিত।

পরিশিষ্ট-২

হরকতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশঃ
কেন্দ্রীয় নির্বাহি কমিটিঃ

১- মাওলানা নজরুল ইসলাম, আমির।
২- মুফতি মাওলানা সফিউর রহমান, ডেপুটি আমির।
৩- মুফতি আব্দুল হাই
৪- মুফতি মঞ্জুরুল হোসাইন।
৫- মাওলানা নিয়মতুল্লাহ ফরিদ।
৬- মাওলানা বাকি বিল্লাহ।
৭- মাওলানা সাইয়েদ আবু তাহের।
৮- মাওলানা শামসুদ্দিন কাশিমি।
৯- মাওলানা আবু নাছির।
১০-মাওলানা ফজলুল হক আমিনি, বাংলাদেশ ইসলামী খেলাফত আন্দোলন।
১১-মাওলানা আতাউর রহমান খান, এক্স এমপি, কিশোরগঞ্জ।
১২- আব্দুল জব্বার, ইয়ং মুসলিম লীগ।
১৩- মাওলানা মহিউদ্দিন, ইসলামী মোর্চা।

উপদেষ্টা কাউন্সিলঃ

১- মাওলানা মহিউদ্দিন খান, চীফ।
২- মুফতি আব্দুল হাই, ডেপুটি চীফ (১৯৯৮ সালের নভেম্বারের ৮ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল)।
৩- মাওলানা মঞ্জুর আহম্মদ (১৯৯৮ সালের নভেম্বারের ৮ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল)।
৪- মাওলানা ফজলুল করিম, চরমোনাইর পীর, ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রধান।
৫- শর্শিনার পীর।
৬- ফুলতলির পীর, সিলেট।

৭- মুফতি শফি আহম্মেদ, হাটহাজারি মাদ্রাসা, চিটাগাং।
৮- মুফতি তাহেরুল্লাহ, পটিয়া মাদ্রাসা, চিটাগাং।
৯- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
১০-মাওলানা কামালউদ্দিন জাফরি।
১১-মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাইদী।
১২-মাওলানা ওবাইদুল্লাহ।
১৩-প্রফেসর আখতার ফারুক।
১৪-মাওলানা শায়খুল হাদিস আজিজুল হক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান।
১৫-মোহম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রিন্সিপাল, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ, সর্বদলীয় উলেমা পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল।

খুলনা ব্রাঞ্চঃ

১- মোহম্মদ সিরাজুল হক, আমির।
২- মহম্মদ আনিসুর রহমান।
৩- মহম্মদ সাত্তারউদ্দিন খান।
৪- কাশেম আলী।

চিটাগাং ব্রাঞ্চঃ

অফিস- জামায়েতুল উলুম মাদ্রাসা, লালখান বাজার, চিটাগাং। চীফ- মাওলানা আজহারুল ইসলাম।
১- আব্দুর রৌফ, আমির।
২- মুফতি শাইকুর রহমান, ডেপুটি আমির।
৩- আব্দুল বাছেত।
৪- আব্দুল খালেদ।
৫- আবু তারেক।
৬- আব্দুল হাকিম।
৭- আমজাদ বেলাল।
৮- ওবাইদুর রহমান খান।
৯- মাওলানা আব্দুল কদ্দুস।
১০-মাওলানা মাহবুবুল আলম, পেট্রন। ঠিকানা- ৭৩ কুসুমবাগ, ধোবারপাহাড়, চিটাগাং।

কক্সবাজার ব্রাঞ্চঃ

মাওলানা সালাহুল ইসলাম, বয়স-৩৬, আল-হারামাইন নামক মক্কা বেইজড এনজিও'তে কর্মরত। রিয়াদ ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। পাকিস্তানের হরকাতুল মুজাহেদিনের করাচী শাখার প্রধানের সাথে খুব ঘনিষ্ট বলে কথিত।

সিলেট ব্রাঞ্চঃ

১- মাওলানা মোহম্মদ আব্দুল করিম, পেট্রন। জামায়াতে উলেমায়ে ইসলামের সিলেট শাখার প্রেসিডেন্ট।
২- ফুলতলীর পীর।
৩- জুনেইদ আহম্মদ, বিয়ানি বাজার।
৪- আব্দুল মতিন, বিয়ানি বাজার।

যশোর ব্রাঞ্চঃ

১- মাওলানা মনিরুল ইসলাম মাদানি, প্যাট্রন।
২- মুফতি আমিনুল হক, রেলওয়ে ষ্টেশন মাদ্রাসার ইমাম।
৩- মাওলানা আব্দুল হাসান মুহাদ্দিস (ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বিএ এবং দেওবন্দ হতে ইসলামী শিক্ষায় এমএ। বর্তমানে যশোরের কওমী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। পুর্ব পাকিস্তান নিজামি ইসলাম পার্টির যশোর শাখার সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন)।
৪- মাওলানা আব্দুর রৌফ, বয়স-৫০। আদি বাস পশ্চিম বাংলার বনগ্রামে। পাকিস্তান আমলে নিজামি ইসলাম পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভুমিকার জন্যে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বর্তমান বাস যশোরের বরান্দিপাড়ায়।
৫- মুফতি আমিনুল ইসলাম।
৬- আব্দুল জব্বার, রিটায়ার্ড ডিএসপি, বাংলাদেশ পুলিশ।
৭- ডি.কে. বক্স, রিটায়ার্ড সুবেদার মেজর. বাংলাদেশ আর্মি।

ব্রাম্মনবাড়িয়া ব্রাঞ্চঃ

১- মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, জামেয়া ইউন্সিয়া মাদ্রাসার প্রধান।
২- আব্দুল করিম, আফগানিস্তানে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত তালেবান মুজাহিদদের লীডার। তার কমান্ডে ১৫ জন তালেবান মুজাহিদ আছে।

কুমিল্লা ব্রাঞ্চঃ

১- কুমিল্লার ইবনে তাহমিনা হাই স্কুলের ইমাম, প্যাট্রন।
২- মোহম্মদ আলী আখতার, কুমিল্লার তালেবান মুজাহিদদের লীডার, তার কমান্ডে ১৫ জন বাংলাদেশী তালেবান আছে।

ট্রেনিং ইষ্টাব্লিশমেন্টসমুহঃ

০১- মহিউরসুন্নালস মাদ্রাসা, নিলা, টেকনাফ, কক্সবাজার (বর্ডারের কাছাকাছি)।
০২- হাটহাজারা মাদ্রাসা, চিটাগাং সদর।
০৩- পটিয়া মাদ্রাসা, চিটাগাং সদর।
০৪- জলপাইতলি এবং তেতুলতলি, জেলা বান্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
০৫- মহেশখালি ও গর্জনিয়া পাহাড়, নাইখংছড়ি, বান্দরবন, পাঃ চট্টগ্রাম।
০৬- রানিপিং, কাজি বাজার এবং মুন্সি বাজার মাদ্রাসা, ফুলতলি, সিলেট।
০৭- বালুছেড়া, কক্সবাজার, প্রধান ক্যাম্প।
০৮- জামায়েতুল উলুম মাদ্রাসা, লালখান বাজার, চিটাগাং।
০৯- ব্রাম্মনবাড়িয়া।
১০- নয়াপাড়া, দামুদিয়া ইউনিয়ন, টেকনাফ, কক্সবাজার।
১১- নরিছা বাজার, চিটাগাং।
১২- রাঙামাটি ইসলামিক কমপ্লেক্স মাদ্রাসা, রাঙামাটি, পাঃ চট্টগ্রাম।
১৩- মহম্মদপুর রহমিয়া জমিয়াতুল মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৪- লালমাটিয়া কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৫- মালিবাগ কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৬- হাজারিপাড়া কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৭- মাদানি কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৮- ফার্মগেট কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৯- গাজিপুর-বমী কওমী মাদ্রাসা।

রেফারেন্সসমূহঃ

(বার্টিল লিন্টনার ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউর একজন সিনিয়র সাংবাদিক)।

০১- বার্টিল লিন্টনারের "বাংলাদেশ- আ ককুন অব টেরর"- ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, হংকং, এপ্রিল ৪, ২০০২, পৃ-১৪-১৭। আলেক্স পেরির "ডেডলি কার্গো", টাইম, হংকং, ভলিউম-১৬০ নং-১৫, অক্টোবর-২১, ২০০২।

০২- রিপোর্ট এন্ড রিয়ালিটি, ফ্রন্টলাইন চেন্নাই, ভলিউম-১৯, নং-২৩, নভেম্বার ৯-২২, ২০০২।

০৩- বাংলাদেশে ইসলামিক গ্রুপগুলির তালিকার জন্যে দেখুন পরিশিষ্ট-১, অফিস বেয়ারারদের নাম ও ব্রাঞ্চসমুহের তালিকার জন্যে দেখুন পরিশিষ্ট-২।

০৪- দ্য এইটথ পার্লামেন্টারি ইলেকশন-২০০১, ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফর কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ, মার্চ-২০০২, পৃ-২।

০৫- দেখুন 'রেজাল্ট সামারি', www.bd-ec.org/election.php37sum=1

০৬- http://www.transparency.org/cpi/2001/cpi2001.html.

০৭- এইটথ পার্লামেন্টারি ইলেকশনস ২০০১, পৃ-১৬১।

০৮- বাংলাদেশ: এটাকস অন মেম্বারস অব হিন্দু মেজরিটি, লন্ডন: এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, ডিসেম্বার ২০০১।

০৯- দেখুন প্যাটার্ণ অব গ্লোবাল টেররিজম ২০০১, অফিস অব দ্য কোঅর্ডিনেটর ফর কাউন্টার টেররিজম, মে ২১, ২০০১।

১০- "ইজ রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম অন দ্য রাইজ ইন বাংলাদেশ"-বার্টিল লিন্টনার। জেইনস ইন্টেলিজেন্স রিভিউ, লন্ডন, মে-২০০২।

১১- মোহম্মদ গোলাম কাবিরের "চেঞ্জিং ফেস অব ন্যাশনালিজম": দ্য কেস অব বাংলাদেশ-দিল্লী, সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃ-২০১।

১২- প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৯।

১৩- দেখুন সাউথ এশিয়া টেররিজম পোর্টাল; বাংলাদেশ, টেররিষ্ট গ্রুপ হুজি।

১৪- ইমারজেন্সি রেসপন্স এন্ড রিসার্স ইনষ্টিটিউট ডেইলি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট. এরি রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট সার্ভিস, জুন-১১, ১৯৯৮, ভলিউম ৪-১৬২।

১৫- প্যাটার্ণ অব গ্লোবাল টেররিজম ২০০১।

১৬- উক্ত এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এনজিও কর্মীর ই-মেইল, তাং-সেপ্টেম্বার ২৫, ২০০২।

১৭- সাউথ এশিয়ান টেররিজম পোর্টাল: কান্ট্রিজ বাংলাদেশ: এ্যাসেসমেন্ট ২০০২।

১৮- তুর্কাইয়া আতায়ভ, কাশ্মির এনড নেইবারস: টেল-টেরর, ট্রুস, এল্ডারশট: এ্যাশগেট পাবলিশিং, ২০০১. পৃ-১৫০।

১৯- প্যাটার্ণ অব গ্লোবাল টেররিজম ২০০১।

২০- স্মল আর্মস সার্ভে-২০০১: প্রোফাইলিং এন্ড প্রব্লেম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এন্ড স্মল আর্মস সার্ভে, জেনেভা, ২০০১, পৃ-১৮১।

২১- দ্য এইটথ পার্লামেন্টারি ইলেকশন ২০০১, পৃ-৯৯।

২২- প্রাগুক্ত।

২৩- এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, ডিসেম্বার ২০০১।

২৪- দ্য হিন্দু, চেন্নাই, জানুয়ারি ২৩, ২০০২।

২৫- ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, হংকং, জুলাই ১১, ২০০২।

২৬- দ্য মুসলিমস অব বার্মা, আ ষ্টাডি অব আ মাইনরিটি গ্রুপ- মোশে ইয়াগার, ১৯৭২।

২৭- প্রাগুক্ত, পৃ-১৯।

২৮- বার্মা ইন রিভোল্ট: অপিয়াম এন্ড ইনসারজেন্সী সিন্স ১৯৪৮- বার্টিল লিন্টনার, চিয়াং মাই: সিল্কওয়ার্ম বুকস, ১৯৯৯, পৃ-৩১৭-৮।

২৯- টেনশন মাউন্টস ইন আরাকান ষ্টেট, জেইনস ডিফেন্স উইকলি, অক্টোবর ১৯, ১৯৯১।

৩০- প্রাগুক্ত।

৩১- ইন্টারভিউজ এন্ড অবজারভেশনস মেইড হোয়েন আই ভিজিটেড দ্য বর্ডার ইন ১৯৯১।

৩২- 'বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নিং ইসলামিষ্ট এক্সট্রিমিজম', সাউথ এশিয়ান ইন্টেলিজেন্স রিভিউ, ভলিউম-১, নং-৯, সেপ্টেম্বার ১৬,২০০২।

৩৩- জেইনস ডিফেন্স উইকলি, অক্টোবর ১৯, ১৯৯১।

৩৪- বার্মা ইন রিভোল্ট- লিন্টনার, পৃ-৩৯৭-৮।

৩৫- বিন লাদেন এন্ড দ্য আল কায়দা নেটওয়ার্ক- আমেরিকান ফোর্সেস প্রেস সার্ভিস, সেপ্টেম্বার ২১, ২০০১।

৩৬- জেইনস ইন্টেলিজেন্স রিভিউ, মে ২০০২।

৩৭- সেকেন্ড ফ্রন্ট অব ইসলামিক টেরর, সুবীর ভৌমিক।

৩৮- ট্রান্সক্রিপ্ট অব জন ওয়াকার ইন্টারভিউ, সিএনএন, জুলাই ৪, ২০০২।

৩৯- আ রেসিপি ফর ট্রাবল: ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, এপ্রিল ৪, ২০০২।

৪০- আই ভিজিটেড দ্য এরিয়া ইনক্লুডিং উখিয়া, ইন মার্চ ২০০২।

৪১- রাইজ অব দ্য রাইট, সালাহউদ্দিন বাবর, নিউজ ম্যাগাজিন বাংলাদেশ, মার্চ ১-১৫, ২০০২।

৪২- তালেবান: দ্য ষ্টরি অব দ্য আফগান ওয়ারলর্ডস: আহম্মদ রশীদ, প্যান বুকস, ২০০১, পৃ-৮৯।

৪৩- প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬।

৪৪- মার্ডারস মোষ্ট ফাউল, আহম্মদ সলিম। নিউজ লাইন, করাচী, নভেম্বার ২৯, ২০০০।

৪৫- প্রোব, মার্চ ১-১৫, ২০০২।

৪৬- প্রাগুক্ত।

৪৭- দ্য রিপোর্টার্স গাইড: হ্যান্ডবুক অন ইলেকশন রিপোর্টিং, ঢাকা। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ২০০১, পৃ-১০০১।

৪৮- প্রাগুক্ত, পৃ-১০১।

৪৯- বাংলাদেশ এ্যাসেসমেন্ট ২০০২, সাউথ এশিয়া টেররিজম পোর্টাল।

৫০- বাংলাদেশ ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস, ঢাকা, ডিসেম্বার ৮, ২০০০।

৫১- http://usinfo.state.govt/topical/pol/terror/0110321

৫২- হলিডে, ঢাকা, মার্চ ৮, ২০০২।

৫৩- এ্যালেক্স পেরি, ডেডলি কার্গো, টাইম, এশিয়ান এডিশন, অক্টোবর ২১, ২০০২।

৫৪- ঢাকা পুলিশ লুক ফর আল কায়দা লিংক, ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, অক্টোবর ১০, ২০০২।

৫৫- প্রাগুক্ত। আরও বেশী জানতে হলে দেখুন -ডেডলি কার্গো, অক্টোবর ২১, ২০০২, টাইম ম্যাগাজিন।